Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 14
Website: https://tirj.org.in, Page No. 117 - 123
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 117 - 123
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

মেরী ওঁরাও : মহাশ্বেতাদেবীর গল্পে স্বাধিকার বোধে স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত এক নারী

ড. শিপ্রা দত্ত (ঘোষ)
সহযোগী অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ
মহারাজা বীরবিক্রম কলেজ, আগরতলা, ত্রিপুরা
Email ID : sipradg70@gmail.com

Received Date *25. 06. 2025*
Selection Date *20. 07. 2025*

Keyword
Tribal, society, selfish, hunt, self-esteem, unity, harassment, hypocritical, expose.

Abstract
Mahasweta Devi in her novel presents the true picture of the happiness and sorrows of backward people of the society in front of the reader. In her short stories also, she reveals the stories of those who are completely separated from the mainstream urban population. They don't demand luxury things or travelling to distant places like so-called civilized people. Their life is very simple, they want simple food to replenish their hunger. Mahasweta Devi wrote many novels and short stories explaining the problems of helpless, destitute and weak people to the common mass who are unaware off. She not only conveys the reader about their problems but also played a pivotal role by solving their problems. Most of the stories written by Mahasweta Devi is based on tribal life who are devoid of their fundamental rights. A selfish class of people has been purposefully depriving the tribals day after day by taking advantage of their weakness on the pretext of various superstitions and myths. Mahasweta Devi's sole aim was to expose the real face of those hypocritical deceivers. One of the most famous stories she wrote is 'Shikar'.

The story 'Shikar' is part of her collection of stories 'Nairite Megh'. This story book was first published between 1970 and 1982. Then, it was reprinted by the National Book Trust in 1993. The story was translated into English as 'The Hunt' and compiled in the book Imaginary Maps (Thema 1993). Translator: Gayatri Chakraborty Spivak.

Discussion

'শিকার' গল্পে মহাশ্বেতা দেবী অন্তেবাসী মানুষদের প্রতিরোধ স্পৃহাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে ভিন্ন সুরে, স্বতন্ত্র আঙ্গিকে রূপায়িত করেছেন। এই গল্পটি আদিবাসী ওঁরাওদের নিয়ে লেখা। এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র মেরী ওঁরাও। মহাশ্বেতা দেবীর ভাষায় –

OPEN ACCESS

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 14
Website: https://tirj.org.in, Page No. 117 - 123
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "বয়স আঠারো, দীর্ঘাঙ্গী, চ্যাপ্টা মুখ নাক, রং তামাটে ফর্সা, সাধারণত ও ছাপা শাড়ি পরে। ওকে দেখলে কেউ আদিবাসী বলবে না। কিন্তু ও আদিবাসী। এক সময়ে কুরুডায় সায়েবদের টিম্বার প্লান্টেশন ছিল। স্বাধীনতার পর ক্রমে ক্রমে সায়েবরা চলে যায়। ডিক্সনদের বাংলো ও বাড়ি দেখাশোনা করত মেরীর মা। ডিক্সনের ছেলে ১৯৫৯ এ এসে বাড়ি, জঙ্গল সব বেচে দিয়ে চলে যায়। যাবার আগে ভিকনির গর্ভে মেরীকে দিয়ে যায়।"[১]

সে শ্বেতাঙ্গ পিতার অর্থাৎ সাহেবের জারজ হিসাবে পরিচিত বলে তার সমাজ তাকে অনেক দূরত্বে ঠাঁই দিয়েছিল। 'আদিবাসী যুবকদের কাছে, মেরীর গায়ের রঙ একটা প্রতিরোধের দেয়াল।' যদিও আবার তাদের সমাজে রীতিনীতির যাবতীয় বেড়াজালের বন্ধন কে ছিন্ন করে দিয়ে মেরী বিশেষ অধিকার অর্জন করে মুক্তির আনন্দে আনন্দিত হয়। সমগ্র সমাজকে নির্মম অত্যাচার থেকে, কঠোরতা থেকে সর্বরকমের ভয় থেকে মুক্ত করতে সমর্থ হয়। সে একাই যেন একশ। মহাশ্বেতা দেবীর ভাষায়, -

> "তোহরি বাজারে মেরীর ভক্তবৃন্দ অগন্য। স্টেশনে নামে ও রানীর মতো। বাজারে গিয়ে নিজের জায়গায় বসে স্বাধিকারে। অন্যান্য বাজারিয়াদের কাছে বিড়ি নেয়। ওদের পয়সায় চা পান খায়, কিন্তু কারুকে আমল দেয় না। বাজারিয়া দের নেতা, মস্তান ছেলে জালিম ওর প্রণয়ী। জালিম অথবা ও, একজনের পয়সা জমে একশো টাকা হলেই ওরা বিয়ে করবে। বিয়ে করবে, এই কথার ভিত্তিতেই ও জালিমকে কাছে আসতে দিয়েছে।"[২]

ওঁরাও সমাজ মেরীর কার্যকলাপ দেখে একদিন সমস্বরে বলতে বাধ্য হয়েছিল, -

> "মেরীর মধ্যে সাচাই আছে, অস্ট্রেলিয়ান রক্তের তেজ।"[৩]

জাত-পাতের যে পবিত্রতা উঁচু জাতকে প্রশ্রয় দেয়, নিচু জাতকে শোষণ করার ক্ষমতা দেয়, অসম্মান করবার অধিকার দেয়, মেরী তার বিরুদ্ধে শক্তি অর্জন করে নিয়ে সমাজকে স্বাধিকার বোধে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল।

মেরীকে ঠিকাদার এসে গাছ কাটার লোভ দেখিয়ে, ছাতু-লঙ্কা-লবণের লোভ দেখিয়ে হাত করতে চেয়েছিল। সবাই বৃথা চেষ্টা করে গেছে। তার পেটে বাচ্চা দিয়ে মরদ পালিয়ে যাবে তা কিছুতেই হতে পারে না। মহাশ্বেতা দেবীর ভাষায়, -

> "প্রণয়ী হতে চেয়েছে বহুবার বহুজন। মেরী দা তুলে দেখিয়েছে। তারা বাইরের মানুষ। ভিকনির মতো, তাকেও পেটে বাচ্চা দিয়ে ওরা পালাবে না, কে কথা দিতে পারে?"[৪]

মেরী দা তুলে সবাইকে দেখিয়ে দেয়। মেরীকে সবাই ভয় পায়। তার স্বাস্থ্য ভাল, অসীম কর্মক্ষমতা, ক্ষুরধার বুদ্ধি। তার বুদ্ধির কাছে সবাই হার মানে। তাকে নানান লোভ দেখিয়ে প্রণয়িনী করতে চেয়েছে অনেকেই কিন্তু সবাই ব্যর্থ হয়েছে। তার টিকির নাগালও কেউ পায় নি। মেরী অন্য আদিবাসী মেয়েদের মতো গতানুগতিক জীবন কাটাতে চায় না। তাই প্রসাদ গিন্নী তার বিয়ের কথা বললে মেরী মুখের উপর বলে দেয়, -

> "ঝোপড়িতে থাকব, ঘাটো খাব, মরদ মদ খাবে, তেল সাবান পাব না, ফর্সা কাপড় পরব না, অমন জীবন আমি চাই না।"[৫]

আদিবাসী সমাজের গতানুগতিক জীবন তার একেবারেই অপছন্দ। সমাজকে ভদ্র করতে, ভাল ভাবে থাকতে শিক্ষা দেয়। ওঁরাও সমাজের চিরাচরিত সংস্কারকে ভেঙে দিয়ে তাদের সামনে সে এক নতুন পথের সন্ধান দিয়েছিল। তহশীলদার মেরীকে দেখে লোভ সামলাতে পারে না। মেরীকে দেখে বলে, -

> "তোকে হেমা মালিনীর মত দেখাচ্ছে।"[৬]

মেরী পাল্টা জবাব দেয়, -

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 14
Website: https://tirj.org.in, Page No. 117 - 123
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "তোমাকে উল্লুর মতো দেখাচ্ছে।"[৭]

মেরীর সাহস ছিল অতিরিক্ত। মালিক, মহাজনদের রক্তচক্ষুকে অবহেলা করার মতো সাহস একমাত্র মেরীই দেখাতে সমর্থ হয়েছে। তহশীলদার ছিল তার জীবনের সবচেয়ে বড়ো শিকার। হোলির উৎসবের দিনে মেরী ওঁরাও দের মতো মেয়েদের যারা প্রতিনিয়ত শিকার করে যেমনভাবে ওর মাকে একদিন কেউ করেছিল, তাদের একজনকে শিকার করে প্রচন্ড সাহস ও বুদ্ধিমত্তার জোরে। তার হাতের চকচকে শান দেওয়া দা হোলির রাতে চাঁদের আলোয় বার বার ওঠে নামে। গানে নাচে মেরী সেদিন সবাইকে মাতিয়ে দেয় এক অনাবিল আনন্দে, আবেগে। অবাক করে দেয় তাদের সমাজের সবাইকে। হোলির উৎসব তাদের প্রধান উৎসব। হরমদেও-র কাছে মানত করে এই বলে, -

> "হে হরমদেও, এমন হোলি বছর বছর হোক। এমনি শিকার বছর বছর করি। মদ দিব তোমাকে।"[৮]

ওঁরাওদের অন্তরে জমে থাকা অনেক পুঞ্জীভূত আক্রোশের এক টুকরো শাস্তি দিতে পেরে তথা প্রতিশোধ নিতে পেরে মেরী খুবই খুশী। সে তার ভাল লাগার, পছন্দের তথা ভালবাসার মানুষের সঙ্গে ঘর বাঁধার স্বপ্ন নিয়ে আজীবন মিলনের উদ্দেশে পাড়ি দেয়। মৃত শিকারের থেকে তার পাথেয় সংগ্রহ করে। কুরুডা পাহাড়ের গা ঘেঁষে অন্ধকারে দ্রুতগতিতে ছুটে চলছে। সবচেয়ে বড় জানোয়ারকে হত্যা করেছে সে। তাই জঙ্গলের কোন জানোয়ারের ভয় তার কাছে তুচ্ছ।

তহশিলদার ছিল তার জীবনের সবচেয়ে বড় শিকার। গল্পের শেষে দেখি তার ভালবাসার বন্ধু জালিমকে নিয়ে সে যে ভবিষ্যৎ স্বপ্ন দেখেছিল তহশীলদারকে হত্যা করে সেই স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দিতে সমর্থ হয়েছিল। দিনটি ছিল তাদের শিকার পরবের দিন। মেরীর জীবনের সবচেয়ে আনন্দের দিন। মহাশ্বেতা দেবীর লেখনীতে তা যেন আরো নূতন মাত্রা পায়, -

> "নালায় নেমে নগ্ন হয়ে স্নান করতে করতে ওর মুখ গভীর তৃপ্তিতে ভরে গেল। যেন পুরুষসঙ্গ করে অশেষ তৃপ্তি পেয়েছেও।"[৯]

এইভাবে মেরী তার অতীত সমাজকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করে ভবিষ্যতের দিকে যাত্রা করে। মেরীর এই উল্লসিত যাত্রাপথের বর্ণনা দিতে গিয়ে মহাশ্বেতা দেবী বলেন, -

> "তখন নাচতে নাচতে মেরী পিছোতে থাকল, পিছোতে পিছোতে অন্ধকারে ওরা নাচছে, মেরী অন্ধকারে ছুটে চলল। পথ ওর নখদর্পণে। অন্ধকারে, তারার আলোয় রেললাইন দেখে পথ চলতে চলতে মেরীর মনে ভয় এলো না, কোন জানোয়ারের ভয়। আজকে ও সবচেয়ে বড় জানোয়ার মেরেছে বলে বন্য চতুষ্পদের বিষয়ে সব প্রাত্যহিক, রক্তে অভ্যাসের ভয় ওর চলে গেছে।"[১০]

মেরী আর তখন তোহরি বাজারের বাজারিয়া নয়, প্রসাদজীর মুনাফার নিষ্ঠাবতী রক্ষয়িত্রী নয়। বড় শিকার করে তার যেন পুনর্জন্ম হয়। 'মদ আর গান, মদ আর নাচ' - এর মধ্য দিয়ে তার নিজস্ব সমাজের জীবনের ছন্দের স্বাদ পায়। তার মধ্যে নিজেকে পুরোপুরি ভাবে নিমজ্জিত করে, নিজের অর্জন করা স্বাধিকার বোধে। মেরী স্বেচ্ছায় চলে আসে জঙ্গল থেকে রেল লাইনে। এ যেন ইতিহাসেরই এক নুতন অমোঘ যাত্রাপথ। কারণ জঙ্গল থেকে সাত মাইল হেঁটে তারপর বাসে যাত্রা করা, রাঁচি, হাজারীবাগে পৌঁছে যাওয়া মানে ইতিহাসের ধারা বেয়ে ভবিষ্যতের নিশ্চিন্ত পথে যাত্রা করে মেরীর স্বপ্নের ভুবন প্রতিষ্ঠা করার নব ইঙ্গিত।

'শিকার' গল্পের ভিত্তি ও পরিবেশ জঙ্গল। এই গল্পের মেরী ওঁরাও কে লেখিকা দেখেছিলেন। কোন কিছুকে সে পরোয়া করে না। সব জায়গাতেই সে তার নিজের ব্যক্তিত্ব নিয়ে চলে। তাই এই গল্পের বিষয় মহাশ্বেতা দেবীর কল্পনার রঙে রঙিন নয়। বানানো কোন গল্প নয়। একেবারে নিজের চোখে দেখা বাস্তব কাহিনী এই গল্পের মুখ্য বিষয়। এই গল্পের প্রেক্ষিত মহাশ্বেতা দেবী তোহরি বাজারে গিয়ে কিছুটা দেখেছেন আর কিছুটা জেনেছেন শীতের রাতে খোলা আকাশের নিচে আগুন পোহাতে পোহাতে গান শুনে। কারণ আদিবাসীরা তো লেখে না, যখন যা ঘটে, তাই নিয়ে গান বাঁধে। যুদ্ধ, লড়াই,

প্রাকৃতিক বিপর্যয়, উৎসব অর্থাৎ তাদের সমাজে ঘটে যাওয়া যে কোন বিষয় ওরা গানের মাধ্যমেই ধরে রাখে সকল স্মৃতি। মহাশ্বেতা দেবী 'শিকার' গল্পের পটভূমি প্রসঙ্গে গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাককে যে কথা বলেছেন তা এ প্রসঙ্গে খুবই উপযোগী।

> "এলাকাটা আমি যেন দেখতে পাই, এতই চিনি, গল্পে যাকে মেরী ওঁরাও বলেছি, তাকে দেখেছি। বিহারেও আছে বাৎসরিক শিকার পরব। এ ছিল ন্যায় বিচার উৎসব। শিকারের পর সমাজপতিরা অপরাধীর বিচার করতেন। ওরা পুলিশের কাছে যেত না। সাঁওতালী ভাষায় এটা 'ল বির্'। 'ল' মানে আইন, 'বির' মানে জঙ্গল। আর বিহারে, প্রতি দ্বাদশ বৎসরে এটা জানী পরব। মেয়েদের শিকার উৎসব। ওই গল্পে বর্ণিত সকল ঘটনাই সত্য। সেদিন মেরী যা করে, ওখানে তা বার বার ঘটেছে। আদিবাসী সমাজে নারী ধর্ষণ, স্ত্রী লোককে অমর্যাদা অবমাননা করা বৃহত্তম অপরাধ। ধর্ষণ ওরা জানে না। আদিবাসী সমাজে মেয়েদের সম্মান আছে। যখন লাপরা যেতাম, দেখতাম ফর্সা মেয়েটি দেহাতী ঢঙে (সামনে আঁচল দিয়ে) হলদে শাড়ি পরে এক বিশাল মোষের পিঠে দিব্যি আরামে বসে আছে। আখ চিবোচ্ছে, কিংবা ভুট্টার খই। তোহরি বাজারে দেখেছি পান চিবোতে চিবোতে ফল ও শাকসবজীর দরাদরি করছে। বিড়িও খাচ্ছে, প্রচুর তর্ক করছে এবং জিতে যাচ্ছে। কি ব্যক্তিত্ব! পরে জানলাম, পছন্দের মুসলিম ছেলেটিকে বিয়ে করার জন্য জানী পরবের দিন ও কি করেছিল, যে লোকটাকে মারে, একটা নেকড়েই বটে। আসল কথা গায়ত্রী, সেদিন ছিল জানীপরব। মেয়েদের শিকার উৎসব। সমগ্র আদিবাসী সমাজের চোখে যা পাপ, তার বিচার করে বাৎসরিক শিকার উৎসবের সত্য অর্থকে মেরী পুনরুজ্জীবিত করেছিল।"[১১]

মহাশ্বেতা দেবীর আদিবাসী জীবন ভিত্তিক গল্পগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, লেখিকা গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে বিভিন্ন গোষ্ঠীর আদিবাসীদের জীবন ও সমস্যার বাস্তব ছবি তুলে ধরেছেন। আদিবাসীদের প্রতি সুদীর্ঘকাল ধরে জোতদার, মহাজন, পুলিশ প্রশাসনের নানা ধরনের অত্যাচার শোষণ ও পীড়নের যথার্থ পরিচয় দান করে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন মানুষ হয়েও আমরা কিভাবে দীর্ঘকাল ধরে সহজ সরল আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে উপেক্ষা করে এসেছি। মহাশ্বেতা দেবীর লেখার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য তাঁর ক্ষুরধার রচনাভঙ্গী। নির্যাতিত জীবনের কাহিনীর মাধ্যমে ব্যাঙ্গ বিদ্রুপে ও মমতায় চরিত্র গুলিকে জীবন্ত করে তোলেন হত দরিদ্র, নুন আনতে পান্তা ফুরায় এমন সব মানুষের কোনরকমে শুধু টিকে থাকার লড়াইকে মহাশ্বেতা দেবী দেখান নি, বা এটার সীমারেখা টেনেই তিনি গল্প শেষ করেন নি। তিনি দেখিয়েছেন গল্পের পাত্র পাত্রীরা নিজেরাই এই বিশাল বিশ্বে মানমর্যাদা নিয়ে অস্তিত্ব পাবার, মানব সমাজে নিজের পরিচয় খুঁজে নেবার বা নিজের যোগ্য মর্যাদার জানান দেওয়ার জন্য লড়াই করে। আর এই লড়াইয়ে তারা পিছ পা হয় না, পরাজিত হয় না। যুক্তি তর্কে তাদেরকে হারিয়ে নিজেরা সেরার সেরা হবার দাবি রাখে। তিনি পাঠকদের বিনোদনের জন্য গল্প রচনা করেন নি। এই 'শিকার' গল্পে রয়েছে শুধুই প্রতিবাদী ভাষা, প্রতিবাদী রং। শেষপর্যন্ত মেরী তহশিলদারের চকচকে লোভকে মুহূর্তে ধূলিসাৎ করে দিতে তার বিন্দুমাত্র দ্বিধা হয়নি। এ যেন মহাশ্বেতা দেবীর সৃষ্টিতেই সম্ভব।

মহাশ্বেতা দেবী বনে জঙ্গলে ঘুরে আদিবাসীদের ঘরের খবর নিয়েছেন। তাঁর ধ্যান জ্ঞান ছিল আদিবাসীদের কল্যাণ সাধন। তাই তাদের জীবনের উপরিভাগ নয় গভীরে প্রবেশ করেছেন। তাদের সঙ্গে থেকেছেন। তাদের আনন্দ বেদনার কথা জেনেছেন। তাদের নানা সমস্যার কথা গল্পে বা উপন্যাসে লিখেই শেষ করেননি। সেই সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন সময়ে প্রতিষ্ঠিত সরকারের কাছে হাজার হাজার চিঠি লিখেছেন। তাদের নিয়ে নানা সমিতি গঠন করেছেন। যাতে করে তারা নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে পারে সেই চেষ্টা করেছেন। তাঁর কথা সাহিত্যের বড় বৈশিষ্ট্য চরিত্র গুলিকে প্রতিবাদী করে গড়ে তোলা। তিনি একদিকে যেমন আদিবাসীরা কি ভাবে উঁচুতলার মানুষের দ্বারা দিনের পর দিন শোষিত, বঞ্চিত, অত্যাচারিত হচ্ছে তা দেখিয়েছেন। তেমনি ভাবে আর এক দিকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলনের মাধ্যমে আদিবাসীদের জাগরণের ভূমিকাকে জ্বালাময়ী ভাষায় বর্ণনা করেছেন এবং তাদের ঐতিহাসিক ভূমিকা বিবৃত করে নূতন যুগের ভাষ্য রচনা করেছেন।

আদিবাসীদের চিন্তা চেতনার মধ্যে তিনি অনেক পরিবর্তন এনেছেন। একটা সময় ছিল তারা সমস্ত কিছুকে নীরবে সহ্য করে যেতো। কিন্তু অনেক রাস্তা পার হয়ে মহাশ্বেতা দেবী তাদের মধ্যে বিপুল পরিবর্তন আনতে সমর্থ হয়েছেন। এর জন্যই হয়তো মেরী ওঁরাও তাদের মধ্যে জমে থাকা পুঞ্জিভূত অপরাধের শাস্তি বিধান করতে পেরে এত খুশী ও তৃপ্তি পেয়েছিল বলেই তার ভালবাসার মানুষের সঙ্গে আজীবন মিলনের উদ্দেশে বহু দূরে অজানার উদ্দেশে স্বপ্নের সংসার গড়ার লক্ষ্যে পাড়ি দিতে সমর্থ হয়েছিল।

মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্য সৃষ্টি শুধুমাত্র শৌখিন মজদুরি নয়। সাঁওতাল, মুন্ডা, শবর, ওঁরাও ইত্যাদি আদিবাসী গোষ্ঠীর নির্যাতিত নর নারীদের জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, অভাব অভিযোগ নিয়ে সৃষ্ট মহাশ্বেতা দেবীর গল্প উপন্যাসের চরিত্ররা নিছক কল্পনা নয়। প্রায় সব ঘটনাগুলোই জীবনের সত্য পটভূমি থেকে নেওয়া। কুশীলবরা রক্ত মাংসের মানুষ এক মূল্যবোধহীন অবক্ষয়প্রাপ্ত সমাজের শোষণ আর অপশাসনের শিকার। একুশ শতকের দরজায় দাঁড়িয়ে আজও যে সমস্ত মানুষ বেঁচে থাকার ন্যূনতম প্রয়োজন টুকুও মেটাতে পারে না, বিজ্ঞান, আধুনিক প্রযুক্তি, বিশ্বায়ন যে সব মানুষের জীবনে স্বপ্নকথার মতো অলীক, ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখার মত সেইসব সর্বহারা অবহেলিত মানুষেরাই উঠে এসেছে লেখিকার লেখনীতে। তাই তাঁর লেখায় বারবার ঘুরে ফিরে আসে জল মাটি ধান এমনকি নুনের জন্য মানুষের রক্তাক্ত সংগ্রামের কথা। রাজনৈতিক বিশ্বাস আর সততার জন্য প্রাণ তুচ্ছ করার কথা। তিনি এমন সব মানুষকে তাঁর সাহিত্যে স্থান দিয়েছেন যারা অনামী, অখ্যাত, অবজ্ঞাত, নির্যাতিত একেবারে সাধারণ শ্রেণীর মানুষ। মহাশ্বেতা দেবী নিজেই লিখেছেন, -

> "ইতিহাসকে তো আমি গণবৃত্তে দাঁড়িয়েই দেখি। রাজাবৃত্তের ইতিহাস লেখেন ঐতিহাসিক। আমি খুঁজি নাম নেই, ঠিকানা নেই সেই সব মানুষকে, যারা শোষণ সহ্য করতে করতে একদিন বিদ্রোহ করে হয়তো জেতে না, মরেও যায়। তাদের সমাধি বা শ্মশানে কোন স্তম্ভ বা ফলক থাকে না। তবু ভারতের ইতিহাসে বারবার দেখি। কোন কোন পরাজয়, জয়ের চেয়ে অনেক মহান হয়ে ওঠে।"[১২]

তহসীলদারকে সে আরও কড়া ভাষায় বলে, -

> "চলতে চলতে একটি ধারাল দা ও ফস্ করে বের করল ও অলস কণ্ঠে বলল, তোমার মতো সরু প্যান্ট, কালো চশমা পরা ঠিকাদার তোহরির রাস্তায় টাকায় দশটা মেলে, তাদের আমি এই দা দেখাই। বিশ্বাস না কর, গিয়ে জেনে এস।"[১৩]

মেরী কাউকে পাত্তা দেওয়ার মেয়ে নয়। কিন্তু তহশীলদার তার সঙ্গ ছাড়ে না। মেরী মুসলমানকে বিয়ে করবে বলে তহশীলদারের জেদ বেড়ে গেল। কারণ সেখানে তহশীলদারের কথায় সব লোক ওঠে বসে। তার কথার খেলাপ করার সাহস কারুর নেই। মেরীর জন্য একটা নাইলন শাড়ি আর প্রসাদজীর জন্য মিষ্টি নিয়ে তাদের দিয়ে আসে। কিন্তু দুঃখের বিষয় মেরী তোহরি গিয়েছিল। ফিরে এসে প্রসাদজীর কাছে সমস্ত শুনে কাপড় নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। তহশীলদারকে খুঁজে বার করে। মহাশ্বেতা দেবীর ভাষায় বলা যায়, -

> "তহশীলদার তাঁবুতে বসে মেয়ে মরদকে পয়সা দিচ্ছিল। প্রচুর মানুষের ভিড়। তারই মধ্যে মেরী ঢুকে পড়ে ও জঘন্য গাল দিয়ে কাপড়টা ছুঁড়ে দেয়। বলে, শহরের রান্ডী পেয়েছিস আমাকে? কাপড় দিয়ে ভোলাতে এসেছিস? ফের বদমাশি করবি তো নাক কেটে নেব।"[১৪]

এই কথা বলে সগর্বে মেরী বেরিয়ে যায়।

তহশীলদারের ঘরে বউ ছেলে আছে। তারপরও মেরীকে খুবই ভালবাসে। মেরীর জন্য সে পাগল। মেরীর পিছন পিছন সে লক্ষ্য রাখে, তাকে অনুসরণ করে। তহশীলদার বাড়ী যাওয়া ছেড়ে দেয়। সে মেরীকে বলে, -

> "তোর মতো মেয়ে মানুষ আমি দেখিনি। লাখ টাকার মাল তুই।"[১৫]

মেরী তাকে কথা দিয়েছে হোলির দিনে সব পুষিয়ে দেবে। তহশীলদার খুবই খুশী। এই খুশীতে তহশীলদার গ্রামের সব আদিবাসীদের মদ খাওয়াতে থাকে। আরও বলে খাসী এনে দেবে। এদিকে মেরী খুব সেজে সব চেয়ে বড় শিকার ধরার জন্য তৈরী। মহাশ্বেতা দেবীর ভাষায়, -

> "মেরী আজ জালিমের দেওয়া নতুন শাড়ী পরেছে, পুঁতির মালা। রঙিন শাড়ি ও লাল জামায় মেরী এখন চলন্ত পলাশ গাছ যেন। যেন বাতাসে এক ঝাঁক পলাশ ফুল ছুটে যাচ্ছে। চারদিকে পলাশ আর পলাশ।"[১৬]

মেরী জোরে চিৎকার করছে, -

> "তহশীলদার, তহশীলদার, আমি এলাম বলে।"[১৭]

মদের নেশায় তার মাতন ধরেছে।

একজন বিখ্যাত সমালোচক মহাশ্বেতা দেবীর লেখায় নারী রচিত উপন্যাসের পরিধি ও বিষয় বৈচিত্র্যে বিস্মিত হয়ে বলেছিলেন, -

> "তিনি উপন্যাস ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃতা নবাগতা। তাঁহার প্রভাব প্রতিশ্রুতি যে উজ্জ্বল মধ্যাহ্ন দীপ্তির পূর্বাভাস ইহা সঙ্গতভাবে প্রত্যাশা করা যাইতে পারে।"[১৮]

যদিও তারপর অনেক পথ অতিক্রম করে আসা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মানে ভূষিত মহাশ্বেতা দেবী আজ আর পরিচিতির অপেক্ষা রাখে না। মহাশ্বেতা দেবীর গল্প-উপন্যাসে তেমন কোন রোমান্টিক কাহিনী নেই। রয়েছে চেনা জগতের অতি পরিচিত মানুষের সুখ দুঃখের বাস্তব কাহিনী যা উপন্যাস ক্ষেত্রে একেবারেই ভিন্ন প্রকৃতির। তাই আর একজন লেখিকা মহাশ্বেতা দেবীর রচনার বৈশিষ্ট্য বলতে গিয়ে বলেন, -

> "কেমন লেখেন মহাশ্বেতা? কী তাঁর লেখার জগৎ? সেখানে কাদের কথা, কোথাকার কথা থাকে? এটুকু বলা যায় দুপুরে একটা ভাত মুখ দেওয়ার আগে যদি কেউ মহাশ্বেতার একটা গল্পের বই হাতে নেন, অচিরেই তাঁর আশা ভঙ্গ হবে। তাঁর লেখা পাঠককে সচকিত করে, নিদ্রা কর্ষণ করে না।"[১৯]

গল্পের নূতন প্লট নির্মাণ, রচনাভঙ্গীর নতুন রীতি, সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নায়ক নায়িকাদের সমস্বরে সরব প্রতিবাদ সব দিক দিয়ে নিঃসন্দেহে কথা সাহিত্যে এক নতুন অধ্যায়ের যোজনা করেছেন। কারণ মহাশ্বেতা দেবীর গল্প-উপন্যাসের কাহিনী পাঠককে ক্ষণ বিনোদনের স্বপ্নিল কোনও জগতে নিয়ে যায় না। কিন্তু তাকে জটিল কোনও প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। কোথাও না কোথাও, কখনও না কখনও এই সব ঘটনা ঘটেই চলে। আর তা মনে করিয়ে দেয় এই সভ্যতা, সমাজ, প্রগতি আমাদের কোথায় নিয়ে চলেছে - সামনের দিকে না পিছনে? তা এখন আমাদের ভাববার সময় এসেছে। মহাশ্বেতা দেবীর নিজের একটি প্রাসঙ্গিক বক্তব্য এখানে উদ্ধৃত করতে পারি, -

> "স্বাধীনতার পরেও আমি অন্ন, জল, জমি, ঋণ, বেঠবেগারী কোনটা থেকে দেশের মানুষকে মুক্তি পেতে দেখলাম না। যে ব্যবস্থা এই মুক্তি পেতে দিল না, তার বিরুদ্ধে নিরঞ্জন, শুভ্র ও সূর্যসমান ক্রোধই আমার সকল লেখার প্রেরণা। দক্ষিণে বামে সকল দলই সাধারণ মানুষকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালনে ব্যর্থ হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। আমার জীবনকালে এ বিশ্বাস বদলাবার কারণ ঘটবে বলে আশা নেই। তাই সাধ্যমতো মানুষের কথাই লিখে গেলাম। নিজের মুখোমুখি হতে যেন লজ্জা না পাই সে জন্য। কেননা লেখক জীবনকালেই শেষবিচারে উপনীত হন এবং উত্তর দেবার দায় থেকে যায়।"[২০]

'শিকার' গল্পের নামকরণ অবশ্যই সার্থক। মেরী তহশীলদারের যোগ্য জবাব দিতে গিয়ে একেবারে তাকে পৃথিবী থেকেই বিদায় করে দেয়। তহশীলদার আর মেরী একটা প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত। আদিবাসী সমাজে বিশেষ করে জোতদার, মহাজন, ঠিকেদার টাকার লোভ দেখিয়ে, লাল চোখ দেখিয়ে সবসময় গরীব মেহনতী মানুষগুলিকে দাবিয়ে রাখে। তাদের

যে নিজস্ব পছন্দ, ভালো লাগা, মন্দ লাগা, চাওয়া পাওয়ার অনেক ইচ্ছা আছে তাদের কোন গুরুত্বই দেয় না। তাই মেরী যথার্থ অর্থে তহশীল দারকেই শিকার করে। যা তার সবচেয়ে বড় শিকার। এইভাবে মেরী ওঁরাও স্বাধিকার বোধে উজ্জীবিত হয়ে নিজের সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে স্বমহিমায়।

Reference:

১. দেবী, মহাশ্বেতা, শিকার, মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প সঙ্কলন, চতুর্থ মুদ্রন, ২০০২, ন্যাশনাল বুকট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, পৃ. ৪৫
২. তদেব, পৃ. ৪৬
৩. তদেব, পৃ. ৪৬
৪. তদেব, পৃ. ৪৬
৫. তদেব, পৃ. ৪৬
৬. তদেব, পৃ. ৫২
৭. তদেব, পৃ. ৫২
৮. তদেব, পৃ. ৫৯
৯. তদেব, পৃ. ৫৮
১০. তদেব, পৃ. ৫৯
১১. ঘোষ, নির্মল, মহাশ্বেতা দেবী অপরাজেয় প্রতিবাদী মুখ, সাক্ষাৎকার গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক ও মহাশ্বেতা দেবী, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৮, করুণা প্রকাশনী, পৃ. ১১৫
১২. দেবী, মহাশ্বেতা, রচনা সমগ্র ১১ দেজ পাবলিশিং কোলকাতা, ২০০৩, পৃ. ৫৮৬
১৩. দেবী, মহাশ্বেতা, শিকার, মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প সঙ্কলন, চতুর্থ মুদ্রন, ২০০২, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, পৃ. ৫২
১৪. তদেব, পৃ. ৫৩
১৫. তদেব, পৃ. ৫৫
১৬. তদেব, পৃ. ৫৭
১৭. তদেব, পৃ. ৫৭
১৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. শ্রীকুমার, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মর্ডান বুক এজেন্সি ২০০১, পৃ. ৩৬৭
১৯. মুখোপাধ্যায়, সোমা, মহাশ্বেতা দেবীর বাছাই গল্প, ভূমিকা অংশ, মডেল পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৯, পৃ. ২
২০. দেবী, মহাশ্বেতা, অগ্নিগর্ভ, ভূমিকা অংশ, করুণা প্রকাশনী, কোলকাতা, ৫ম মুদ্রণ, ১৪০৬ বঙ্গাব্দ।